চিন্তাধারা

ইসলাম ও সেক্যুলারিজম

ডা. জাকির আবদুল করিম নায়েক

অনুবাদ : হামিদুল ইসলাম সোহেল

PEACE TV খ্যাত ডাঃ জাকির নায়েক পেশায় একজন চিকিৎসক হলেও তিনি এখন একজন দা'য়ী বা ধর্ম প্রচারক হিসেবেই বিশেষভাবে পরিচিত। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থগুলোও পৃথিবীতে সাড়া জাগিয়েছে। তাঁর লেখা Islam and Secularism বইটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ সংখ্যা থেকে এর বাংলা রূপান্তর 'জিজ্ঞাসা'য় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করা হচ্ছে - প্রধান সম্পাদক

উত্তর: যীশু খ্রিষ্ট ভালবাসার কথা বলেছেন, কিন্তু আপনারা দেখবেন ধর্ম পালনের দিকে দিয়ে খ্রিষ্টানদের থেকে মুসলমানদের সংখ্যাটা বেশি। খ্রিস্টানদের সংখ্যা প্রায় ২০০ কোটি, আর মুসলমানদের সংখ্যা ১২০ কোটি। কিন্তু তুলনামূলকভাবে গণনা করলে ধর্ম পালনকারী মুসলিমদের সংখ্যা বেশি পাওয়া যাবে। সুতরাং কতজন খ্রিস্টান যীশু খ্রিস্টের এ কথা মেনে চলছে তা প্রশ্ন সাপেক্ষ। যদি তারা তাদের ধর্মের কথা মেনেই থাকত তাহলে বিশ্বব্যাপী তাদের যে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও আদর্শিক অত্যাচার সেটা থাকত না। শ্রী শ্রী রবিশংকরও ভালবাসার কথা বলেছেন, কিন্তু আমাদের নবীজী (স:) শুধু ভালবাসার কথা বলেই ক্ষান্ত থাকেননি; বরং তিনি তাঁর কথা বাস্তবায়ন করে দেখিয়ে দিয়েছেন। হাদীসে এসেছে, যে ব্যক্তির আশেপাশের চল্লিশ ঘর পর্যন্ত প্রতিবেশীর কেউ না খেয়ে থাকে সে ভরাপেটে ঘুমানোর অধিকার রাখে না। কি চমৎকার শিক্ষা। অথচ আপনি অমুসলিম ও সিউডো মুসলিমদের মিডিয়াগুলোতে দেখলে লক্ষ্য করবেন যে, তারা ইসলামের ন্যায়বিচারের কথা হয়ত ঘুরিয়ে, পেঁচিয়ে পরিবেশন করছে। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (স:) যে প্রতিবেশীদের ভালোবাসার কথা বলেছেন তা ন্যূনতম প্রচার করছে না। তাদের এ আচরণে মনে হতে পারে যেন নবী (স:) ভালোবাসার কথা প্রচারই করেননি (নাউযুবিল্লাহ)।

শ্রী শ্রী রবীশংকর শুধু এ পুস্তকের মাধ্যমে ভালোবাসার কথা প্রচারেই সীমাবদ্ধ থেকেছেন। উল্টো ইসলামকে নিয়ে যে বুকলেটটি তিনি প্রকাশ করেছেন তা

রীতিমত অবমাননাকর। ইসলামে যাকাত ফরয করা হয়েছে। কোরআনে বলা হয়েছে "ধনীদের সম্পদে আছে দরিদ্র ও বঞ্চিতদের অধিকার।" এ বিষয়গুলো কখনও মিডিয়াতে ফোকাস হয় না। মিডিয়াতে বরং ইসলামী শরীয়াহতে ধর্মের অবমাননাকর যে শাস্তি নির্ধারিত আছে সেটা এমনভাবে প্রচার করা হয় যেন ইসলাম কি নির্মম! সূরা মায়িদার ৩৩ নং আয়াতে উল্লেখ আছে, "যদি কেউ আল্লাহ ও রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে ও বিধ্বংসী কর্মকাণ্ড করে বেড়ায় তাহলে হয় তাকে হত্যা কর বা ক্রুশবিদ্ধ কর বা তার হাত পা কেটে ফেল অথবা নির্বাসন দাও।" একটি ইসলামী রাষ্ট্রের অধীনে কোন ধর্মদ্রোহীর জন্য এটাই শাস্তির বিধান। কিন্তু ইসলাম বিদ্বেষীরা এ ধরনের শাস্তির কথা শুনে আঁতকে উঠে, সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড বলে আখ্যা দেয়।

যৌক্তিকভাবে বিবেচনা করলে এটা সুস্পষ্ট যে, এখানে সন্ত্রাসের কোন কথা নেই। কারণ কোন ব্যক্তি যদি অপর ব্যক্তির মায়ের বিরুদ্ধে কুৎসা রটায়, তার বদনাম করে, তার ক্ষতি করে তাহলে দ্বিতীয় ব্যক্তি তার অধিকার বলেই প্রথম ব্যক্তির বিরুদ্ধে রেগে যাবে কিংবা শাস্তির ব্যবস্থা নিতে চাইবে। ঠিক তেমনি একজন মুসলিম ব্যক্তি কোরআনের হুকুম অনুযায়ী তার মায়ের চেয়েও বেশি আল্লাহর ও তার রাসূলকে বেশি ভালবাসে। বিধায় আল্লাহ ও রাসূলের বিরুদ্ধে অবমাননাকর কোন কথা বা কাজ সংঘটিত হলে দায়ী ব্যক্তির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে চাইবে। এটাই যৌক্তিক ও প্রাকৃতিক। অন্য কোন ধর্মানুসারীরা তাদের নবী-রাসূলকে ভালবাসে না সেটা তাদের ব্যাপার, কিন্তু প্রকৃত মুসলিমরা তাদের নবী (স.)-কে তাদের মা, বাবার, স্ত্রী সন্তানের চেয়েও বেশি ভালবাসেন। সুতরাং আমাদের নবী (সা.) ভালবাসার কথা শুধু বলেননি; বরং তা বাস্তবায়ন করে দেখিয়ে গেছেন। এ ক্ষেত্রে মিডিয়ার কৌশলীদের অপপ্রচারে বিভ্রান্ত হওয়া যাবে না।

প্রশ্ন. একবার এক কোম্পানী বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম লেখা জুতো বের করলে পরে মুসলিমরা প্রতিবাদ জানালো- জুতার দোকানে পাথর ছুঁড়ে মেরে, হরতাল করে, আমার প্রশ্ন হল এভাবে স্ট্রাইক করলে বা হরতাল করলে তারাও

ক্ষতিগ্রস্ত হয় যারা এর সাথে জড়িত নয়, তাহলে এ ধরনের কাজ কি ইসলাম জায়েয আছে?

উত্তরঃ আগের একটি প্রশ্নের উত্তরে এ ব্যাপারে বলা হয়েছে যে, কিভাবে ইসলামের প্রতি অবমাননাকর কোন ঘটনার প্রতিবাদ করা যায়? সেখানে ছয়টি পদ্ধতির কথা বলা হয়েছে। আপনি যে ঘটনা উল্লেখ করেছেন সেটা হল ছয় নম্বর পদ্ধতি, যে পদ্ধতিতে মুসলিমরা প্রতিবাদ করে থাকে। কিন্তু এ ধরনের ঘটনায় প্রথমে নন ভায়োলেট পদ্ধতিতে প্রতিবাদ করা দরকার। যেমন- মিডিয়ার মাধ্যমে এর প্রতিবাদ জানানো যেতে পারে। সে কোম্পানীর জুতো না কিনে অর্থনৈতিক চাপ সৃষ্টি করা যেতে পারে। এ সকল পদ্ধতিতে কাজ না হলে তখন ষষ্ঠ পদ্ধতিতে প্রতিবাদ জানানো যায়। তবে সেক্ষেত্রে যারা দোষী নয় তাদের দোকান ভাঙ্গা বা দোকানে পাথর ছুঁড়ে মারা এগুলো গ্রহণযোগ্য নয়। হরতাল করার মাধ্যমে যেহেতু এখানে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে সেহেতু হরতালও বৈধ হবে না।

প্রশ্ন. আপনি যে ছয়টি পদ্ধতির কথা বললেন, নবীজী (সা.) তার বিরুদ্ধে অপবাদ বা বদনাম এর প্রতিবাদে উক্ত পদ্ধতির একটিও ব্যবহার করেননি। কিন্তু তথাপি ইসলাম সম্প্রসারিত হয়েছে। সুতরাং আমাদের কি ইসলামের বিরুদ্ধে অপবাদ বা নবীজী (সা.)-এর অবমাননার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার দরকার আছে?

উত্তরঃ এখানে দুটো বিষয় লক্ষ্য রাখা দরকার। প্রথমতঃ নবীজী (সা.) কোন কাজ না করার মানে এ নয় যে তা আমরা করতে পারব না। নবী (সা.) যেটা করেছেন সে কাজটাই কেবল বৈধ। যেটা তিনি বলেছেন সেটা সুন্নত এবং ক্ষেত্রবিশেষে ফরজ। কিন্তু নবী (সা.) যেটা করেননি সেটা নিষিদ্ধ এমন কোন নিয়ম নেই। কেউ যদি বলে আমি মাইক ব্যবহার করব না, কারণ নবীজী (সা.) ব্যবহার করেননি, তাহলে সেটা অযৌক্তিক হবে। কারণ নবীজী (সা.) এর সময় মাইক আবিষ্কার হয়নি। তবে নবী (সা.)-এর যদি এমন কোন হাদীস পাওয়া যায় যেখানে তিনি মাইকের ব্যবহার নিষিদ্ধ করেছেন, তাহলে সেটা হারাম। অনুরূপ নবী (সা.) মেডিকেলে ভর্তি হননি বলে কি আমরা ভর্তি হতে পারব না?

দ্বিতীয়তঃ প্রতিবাদের উপায় নির্ভর করে সমসাময়িক পরিস্থিতি ও পারিপার্শ্বিক পরিবেশের ওপর। আর নবী করীম (সা.)কে তাঁর নিজের বিরুদ্ধে আনিত অবমাননাকরের মুখোমুখি হতে হয়েছিল। নবী করীম (সা.) মক্কায় থাকা অবস্থায় এর প্রতিবাদ না করার অন্যতম কারণ ছিল তাদের জীবনকে হুমকির মুখে ঠেলে না দেয়া। আরেকটা কারণ ছিল, তার অপরিসীম দয়া। পরবর্তীতে মহানবী (সা.) যখন মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্র গঠন করলেন তখন প্রতিবাদের শক্তি মুসলমানদের সঞ্চিত হয়েছিল। কিন্তু মহানবী (সা.) অপরাধীদের ক্ষমা করে দিয়ে মহৎ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। যেমন- মক্কা বিজয়ের পর মক্কার কাফেরদের শুধু ক্ষমা করে দেয়াই হয়নি; বরং তাদেরকে নিরাপত্তা দেয়া হয়েছিল। এর চেয়ে বড় মহত্তের দৃষ্টান্ত পৃথিবীর ইতিহাসে আর নেই।

সুতরাং কোন ব্যক্তি যদি তার নিজের বিরুদ্ধে সংঘটিত কোন অপরাধের জন্য অপরাধীকে ক্ষমা করে দেয় তা ভিন্ন কথা। কিন্তু নবীজী (সা.)-এর বিরুদ্ধে আনিত অপবাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা আমাদের জন্য আবশ্যক। তিনি নিজে ক্ষমা করে দিতে পারে, কিন্তু খলিফার জন্য এ অপরাধের শাস্তি বিধান করা বাধ্যতামূলক। যেমন- একজন বিচারক যদি তার নিজের বাসায় চুরির অপরাধে চোরকে ক্ষমা করে দেন, দিতে পারেন কিন্তু আদালতের কাঠগড়ায় কোন চোরের চুরি প্রমানিত হলে উক্ত চোরের শাস্তি বিধান করা তার জায়েয।

এছাড়া নবী করীম (সা.)-এর সাহাবারা যারা দুর্দান্ত সাহসী ছিলেন। যেমন- ওমর (রা.) বিভিন্ন সময়ে নবীজী (সা.)-এর বিরুদ্ধে তথা ইসলামের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনার জবাব দিতে চেয়েছিলেন আঘাতের মাধ্যমে। কিন্তু তারা নবী করীম (সা.)-এর নির্দেশে নিজের ক্রোধের বিরুদ্ধে জিহাদ করে তা থেকে বিরত থাকার মাধ্যমেই সর্বোত্তম ও শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ জানিয়েছেন। আমাদের উচিৎ এ মহৎ দৃষ্টান্তগুলো তুলে ধরে অমুসলিমদের কাছে ইসলামের পরিচয় সুস্পষ্ট করে তোলা।

কোন অন্যায় দেখলে আমাদের নবী (সা.)-এর হাদীস অনুসারে সম্ভব হলে হাত দিয়ে ঠেকাতে হবে সেটা না পারলে কথা দিয়ে বিরত রাখতে হবে আর সেটাও সম্ভব না হলে মনে মনে ঘৃণা করতে হবে। আর শেষটা হল দুর্বলতম ঈমানের

পরিচয়। সুতরাং আমরা আমাদের ব্যক্তিগত পর্যায়ে কোন ব্যক্তি আমাদের ক্ষতি করলে তাকে ক্ষমা করতে পারি। কিন্তু নবী (সা.)-এর বিরুদ্ধে অপবাদ রটানো হলে, ইসলামকে হেয় করা হলে আমাদের ব্যক্তিগত ও সামাজিকভাবে এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে হবে। বিশেষ করে বর্তমান বৈশ্বিক পরিস্থিতিতে আমাদের জন্য প্রতিবাদ করাটা আরও জরুরী। সে ক্ষেত্রে পরিস্থিতিভেদে উপরিউক্ত ছয়টা পদ্ধতিই অনুসরণ করতে পারি।   (চলবে)